ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্য

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রবর্তন করা হয়নি। বিভিন্ন খাতওয়ারি কিছু সীমা উল্লেখ করা আছে তার বাস্তবায়ন নিয়েও নানা প্রশ্ন আছে। গামেন্টস খাতে মজুরি ও নিরাপত্তা নিয়ে নতুন পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠন একক ও যৌথভাবে এই আন্দোলনে সক্রিয় আছে। এই খাতে যেসব সংগঠন সক্রিয়, ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি তাঁরা কীভাবে দেখছেন তা তাঁদের অবস্থানপত্র থেকে পরিষ্কার হয়। এখানে পরপর তাঁদের বক্তব্য প্রকাশিত হলো।

গার্মেন্ট শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের বক্তব্য

উন্নয়নের জোয়ারে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে চারপাশে মেলা হাঁকডাক। সম্প্রতি দেশ নিম্ন থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাংকের দেয়া সুনামও কুড়িয়েছে। ১০৪৬ থেকে ৪১২৫ মার্কিন ডলার বার্ষিক আয় হলেই নিম্ন মধ্যম আয়ের সীমারেখায় পৌঁছা যায়। আমাদের জনগণের গড় বার্ষিক আয় এখন ১৩১৪ মার্কিন ডলার (১০২৪৯২ টাকা), মাসিক আয় ৮০০০ টাকার ওপরে। মন্ত্রী-মিনিস্টার থেকে শুরু করে আমলা, মোক্তার, সরকারি চাকুরে, এমনকি সরকার বাহাদুর–সবার আয় বেড়েছে। সরকারি কর্মকর্তার আয় সর্বনিম্ন বেসিক ৮২৫০ টাকা (সব মিলিয়ে ১৭৩৬২ টাকা), সর্বোচ্চ বেসিক ৮০০০০ টাকা । 'উন্নয়নের' এই হিসাবের সাথে দেশের বেশির ভাগ শ্রমজীবী মানুষের আয়ের ফারাক যোজন যোজন। রপ্তানি আয়ের শীর্ষে অবস্থানকারী পোশাক খাতের শ্রমিকদের অবস্থাও এক্ষেত্রে বিশেষ নাজুক। বর্তমানে পোশাক শ্রমিকদের মূল মজুরি ৩০০০ টাকা, সব মিলিয়ে ৫৩০০ টাকা। এই টাকায় শ্রমিকের বেঁচে থাকা কতটা কঠিন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কটা টাকা বেশি পাওয়ার জন্য ওভারটাইম আর নাইট করা তরুণ শ্রমিকের ক্লান্ত জীর্ণ পুষ্টিহীন চেহারাই তার সাক্ষী।

কে না জানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই আসে পোশাক শ্রমিকদের হাত ধরে। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধস এবং হাজারো শ্রমিকের প্রাণ হারানোর মতো বড় ঘটনার পরও ২০১৪ সালে রপ্তানি আয় কমেনি। ২০১৪ সালেই মালিকপক্ষ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে বার্ষিক ২৪ বিলিয়ন ডলার আয়ের এই খাতকে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে তরুণদের নিয়ে এই পরিকল্পনা তাদের জীবনের মান বৃদ্ধি না করে, নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কি সেই লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব? আমরা মনে করি, শ্রমিককে নিঃস্ব ও নিঃশেষ করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো কিংবা শিল্পের বিকাশ কোনোটিই সম্ভব নয়। শ্রমিক ও শিল্পের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিল্পের উৎপাদনশীলতা টিকিয়ে রাখতে এবং শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজন শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি। তাই জাতীয় স্বার্থে সরকার ও মালিকপক্ষের কাছে পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানাই আমরা।

পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছিল ২০১৩ সালের শেষ দিকে। ওই সময় শ্রমিকরা দাবি করেছিল বেসিক ৮০০০ টাকা, সর্বমোট ১২০০০ টাকা। সেই দাবি অগ্রাহ্য করে সরকার নতুন মজুরি নির্ধারণ করে মূল মজুরি ৩০০০ টাকা, সব মিলিয়ে ৫৩০০ টাকা (৩০০০ মূল+১২০০ বাসাভাড়া+চিকিৎসা ২৫০+যাতায়াত ২০০+খাদ্য ভাতা ৬৫০), যেটি ওই সময়ের জন্যই ছিল অপ্রতুল। টাকার দামে মজুরি বাড়লেও শ্রমিকের প্রকৃত আয় তখনও বাড়েনি। এরপর গত তিন বছরে বাজারে চাল-ডাল, আলু-পটোল, তেল-নুনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছে দফায় দফায়। মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে। থেমে থাকেনি বাড়িভাড়া, বাসভাড়া, গ্যাস-পানি-বিদ্যুতের দাম। বেড়েছে বাচ্চার স্কুলের বেতন, ডাক্তারের খরচ সব কিছু। কেবল বাড়েনি শ্রমিকের শ্রমের দাম। এই অবস্থায় একজন শ্রমিক তার চার সদস্যের পরিবার নিয়ে কিভাবে চলবে–এই প্রশ্ন আমরা মালিকপক্ষকেই করতে চাই। একটি পরিবারের প্রতি সদস্যের প্রায় ৩০০০ ক্যালরির খাদ্যচাহিদা পূরণ করে বেঁচে থাকতে মাসিক কত টাকা লাগে? ১২০০ টাকায় শ্রমিক অঞ্চলের কোথাও কি নিম্নমানের একটি ঘর কিংবা বারান্দাঘরও পাওয়া যাবে? ওষুধপত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হয় বাদই দিলাম, একজন এমবিবিএস ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হলেও ৫০০ টাকার নিচে ফি দেয়া যায় কি? সরকারি বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা হাতের নাগালে পায় কজন? যেখানে সর্বনিম্ন দূরত্বে ৫ টাকার নিচে বাসভাড়া নেই, সেখানে ২০০ টাকায় একজনের মাস চলে কিভাবে? এসবের যথাযথ উত্তর মালিকপক্ষ দিতে পারবে না জানি। উল্টো তাদের আচার-আচরণে মনে হয়, শ্রমিকের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। তাই কম খেয়ে, অপুষ্টিতে, অস্বাস্থ্যকর ও নিরাপত্তাহীন পরিবেশে অধিকারহীনতায় বাঁচাই শ্রমিকের নিয়তি।

আমরা এই নিয়তি মানতে নারাজ। পোশাক শ্রমিকরা এদেশের নাগরিক। নাগরিক অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্যই মজুরি বৃদ্ধি বর্তমানে জরুরি দাবি। সাধারণ মজুরি নির্ধারণের জন্য পরিবারের খাদ্য খরচ, ক্যালরির হিসাব, বাজারদর, মুদ্রাস্ফীতি, শ্রমিকের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার শর্তসমূহ আইএলও, জাতিসংঘ এবং আমাদের সংবিধানে বিবেচনার জন্য উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রম আইনে কার্যত সরকার সেই বিবেচনা রাখে না। আমরা হিসাব করে দেখেছি, একজন শ্রমিকের পরিবারের সদস্যসহ মাসে সবনিম্ন খরচ হলেও প্রায় ২৮৬২০ টাকা লাগে। তার পরও দেশের পরিস্থিতি, শিল্পের অবস্থা, পে স্কেল বিবেচনা করে আমরা সরকার ও মালিকপক্ষের কাছে দাবি করেছি মূল মজুরি ১০০০০ টাকা আর মোট মজুরি ১৬০০০ টাকা (মূল মজুরি ১০০০০+মধ্যমানের এক রুম ৪০০০+চিকিৎসা ৫৭০+যাতায়াত ৩০×২৬=৭৮০, টিফিন ভাতা ৬৫০)।

নিম্ন আয়ের সীমা অতিক্রম করায় দেশ অনেক বাহবা কুড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দেশের জাতীয় আয় বাড়াতে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি সেই শ্রমিকরা নিম্ন মধ্যম আয়ের সীমায় পৌঁছেনি। পেরোতে পারেনি দারিদ্র্যসীমা। এখনও এদেশের শ্রমিকরা সারা দুনিয়ায় সস্তা শ্রমিক হিসেবে পরিচিত। মুনাফার পাহাড় গড়ার জন্য দেশীয় মালিকদের পাশাপাশি বিদেশি ক্রেতারা ছুটে আসে আমাদের দেশে, অথচ শ্রমিকদের তৈরি পণ্যে বাড়তি পয়সা দিতে চায় না। আমরা মনে করি, পোশাক শ্রমিকের বর্তমান দুরবস্থার জন্য সরকার-

মালিক-বিদেশি ক্রেতা–এই তিন পক্ষই দায়ী। একই সাথে মালিকদের যেমন মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে, তেমনি বিদেশি ক্রেতাদেরও পণ্যের মূল্য বাড়াতে হবে। আর মজুরি বৃদ্ধি যাতে যথাযথভাবে হয় তার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

মজুরিসহ অন্যান্য দাবি-দাওয়া নিয়ে দর-কষাকষির সর্বজনস্বীকৃত পথ হলো ট্রেড ইউনিয়ন। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার চাইলেই শ্রমিকের ওপর চাকরিচ্যুতিসহ নানা হয়রানি নেমে আসে। যে দেশে শ্রমিক আন্দোলন প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হওয়ার অবস্থায় নেই, যেখানে ট্রেড ইউনিয়নগুলো মালিক-সরকারের পকেটস্থ, যেখানে শ্রমিকাঞ্চলে স্থানীয় মাস্তানসহ বিভিন্ন সংস্থার দৌরাত্ম্য এবং মাসোয়ারাভোগী বেইমান 'শ্রমিক নেতায়' অধ্যুষিত, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী ও বিদেশি দাতা সংস্থার প্রভাব বিদ্যমান, সেখানে আন্দোলন ছাড়া মজুরি বৃদ্ধির আর উপায় কি? একমাত্র শ্রমিক স্বার্থে প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পারে শ্রমিকের জীবনমান বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিতে। শ্রমিকের হাতে আন্দোলন ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। সেই অস্ত্র সুসজ্জিত করে মজুরি বৃদ্ধি এবং প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ও সৎ নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব ও আন্দোলন তৈরির আওয়াজ তোলার জন্য শ্রমিকসহ দেশের আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই। আমরা জানি এসব বললেই তেড়ে আসবে মালিক, মালিকের স্থানীয় মাস্তানবাহিনী, পোষা বেইমানের দল, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের লাঠিয়ালবাহিনী। কিন্তু যত যেই ধেয়ে আসুক সত্য চাপা থাকার নয়। কারণ এই সত্যের সাথে আছে শ্রমিকের মরা-বাঁচার প্রশ্ন, অস্তিত্বের প্রশ্ন। পেটে ভাত না থাকলে, গায়ে কাপড় না চড়লে, মাথার ওপর ফুটো চাল জোড়া না লাগলে কিংবা আপনজনের চিকিৎসা না হলে অস্তিত্বই নড়বড়ে হয়ে যায়। তাই চুপ থাকার উপায় নাই। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর বড় অংশ পোশাক খাতে কর্মরত। তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না হলে দেশে গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা পাবে না। তাই এমন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যা বিদ্যমান রাষ্ট্র ও সমাজ পরিবর্তন করে শ্রমিকবান্ধব রাষ্ট্র তৈরিতে ভূমিকা রাখবে। শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি। আসুন, সেই দাবি পূরণে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, আন্দোলন করি মজুরি বৃদ্ধির এবং প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ও নিরাপত্তার।

আমাদের দাবি–

১.শিল্প ও শ্রমিক বাঁচাতে মূল মজুরি ১০০০০ এবং মোট মজুরি ১৬০০০ টাকা করতে হবে। ১০% বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে। নতুন মজুরির আগ পর্যন্ত ৫০% মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে। শ্রমিকদের জন্য কলোনি/ডরমিটরি গড়ে তুলতে হবে। তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২.সোয়েটার শ্রমিকদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পিস রেট নির্ধারণ করতে হবে।

৩.কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সকল কারখানায় নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও গণতান্ত্রিক কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তাজরীন, রানা প্লাজা ও টাম্পাকো কারখানায় শ্রমিক হত্যার জন্য দায়ীদের বিচার করতে হবে।

৪.অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করতে হবে। কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

৫.নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। ৬ মাস স্ববেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে। ডে কেয়ার সেন্টার চালু করতে হবে।

[গার্মেন্ট শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি কর্তৃক ৩০/১০/২০১৬ তারিখে প্রকাশিত লিফলেট। সদস্য সংগঠনগুলো হলো : গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম, বাংলাদেশ গার্মেন্টস টেক্সটাইল ফেডারেশন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন, ওএসকে গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল ফেডারেশন, জাতীয় সোয়েটার গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, জাতীয় পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন, বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি, গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলন, গার্মেন্টস শ্রমিক সভা, সমন্বিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি]

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের বক্তব্য

বাংলাদেশের উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনো দ্বিধা কি কারো আছে? একবাক্যে সবাই বলবেন, শ্রমজীবী মানুষই অর্থনীতি ও উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি। আবার যদি জানতে চাওয়া হয়, দেশে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত কারা? শারীরিকভাবে দুর্বল, অসুস্থ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে কারা? মাথাপিছু আয় কম, এমনকি সবচেয়ে কম মজুরি পায় কারা–এরকম প্রশ্ন যতই করা হোক না কেন, উত্তর কিন্তু একটাই, তা হলো বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ। সেই শ্রমিকের মজুরি কত হলে তা ন্যায্য হয় এটা নির্ধারণ করা নিয়ে শ্রমিক-মালিক-সরকারের ত্রিমুখী লড়াই চলছে। মালিক বলে, মজুরি বাড়ানো সম্ভব নয়, সরকার বলে, মালিকদের স্বার্থও তো দেখতে হবে। একদল অর্থনীতিবিদ হিসাব দেখিয়ে বলেন, বিশ্ববাজার, মালিকদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা–এসব বিচার করে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করতে হবে, যাতে দুই পক্ষই জেতে। অভিজ্ঞতা বলে, এসব যুক্তি শেষ পর্যন্ত মালিকদের পক্ষেই যায়। মালিক-সরকার-বুদ্ধিজীবী যদি এক পক্ষে দাঁড়ায় তাহলে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষেও যুক্তি নিয়ে দাঁড়ানো জরুরি হয়ে পড়ে। আমাদের জাতীয় ফেডারেশন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট দীর্ঘদিন ধরেই মজুরি নির্ধারণের মাপকাঠি কী হওয়া উচিত তা বলে আসছে। মজুরি বাজারদর-শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয়। মজুরির পরিমাণ নিয়ে মালিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব আর শ্রমিকের মনোভাব বিপরীত। মালিক বলে, আমরা যা দিচ্ছি তা যথেষ্ট; শ্রমিক বলে–সব জিনিসের দাম বাড়ছে, এই মজুরিতে আমার পোষায় না, এ মজুরি কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। তাহলে বিতর্কের সমাধান কোথায়? মজুরি কত হলে তা ন্যায্য হবে? মজুরির পরিমাণ তো সব সময় এক থাকে না, মজুরি নির্ধারণের মাপকাঠিই বা কী হবে? বর্তমান সময়ে ন্যূনতম মজুরি কত হলে তা শ্রমিকদের বাঁচার মতো হবে, তা নিয়ে যুক্তিসংগত আলোচনা হওয়া উচিত।

দেশের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশ আসে গার্মেন্ট খাত থেকে। গত বছর বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৩০ বিলিয়ন ডলার, এর মধ্যে ২৪ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা গার্মেন্ট খাত থেকে আয় হয়েছে। ১৯৭৮ সালে দুটি গার্মেন্ট কারখানা এবং ১২০০০ ডলার রপ্তানি আয় দিয়ে যে শিল্পের যাত্রা শুরু, সেখানে আজ প্রায় ৪৫০০টি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। ৪০ লাখ শ্রমিক এই শিল্পের সাথে যুক্ত। পৃথিবীতে ২৬টি গার্মেন্ট রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে সস্তা শ্রমিকের দেশ। চীনের পর বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

একজন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময় কাজ করার পর কাজের বিনিময়ে যে

অর্থ পায় তাকে মজুরি বলে। মজুরি সাধারণত মাসিক ভিত্তিতে হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক, দৈনিক বা পিস রেট ইত্যাদি রূপেও হতে পারে। আইএলও কনভেনশনের ১৩১ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবনযাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।' বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক কর্মীর নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম এমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, যুক্তিসংগত অথবা মানবিক মর্যাদা রক্ষা করার মতো মজুরি নির্ধারণ করা হবে কিভাবে? একটি শ্রমিক পরিবারে কী কী দরকার হয়? অন্তত তিন বেলা খাবার, পোশাক, মাথা গোঁজার ঠাঁই, অসুস্থ হলে চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা, বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয়, অতিথি আপ্যায়ন ও বিনোদন ছাড়া মানবিক জীবন কিভাবে হয়? এসব বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ন্যূনতম মজুরির বিধান আছে। অন্তত ৯০টি দেশে ন্যূনতম মজুরি আইন করে নির্ধারণ করা হয়। ন্যূনতম মজুরি আইন প্রথম করা হয় নিউজিল্যান্ডে, ১৮৯৬ সালে। এরপর অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৯৯ সালে, ব্রিটেনে ১৯০৯ সালে, শ্রীলঙ্কায় ১৯২৭ সালে এবং ১৯৩৬ সালে ভারতে, ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানে প্রবর্তন করা হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে বিবেচনায় নিয়ে ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন, মরিশাস, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে প্রতিবছর মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। কানাডায় করা হয় দুই বছর পর পর। বাংলাদেশে পাঁচ বছর পর পর মজুরি পুনর্নির্ধারণের আইন করা হয়েছে।

মজুরি কত হলে বাংলাদেশের বিবেচনায় তা ন্যূনতম মজুরি হবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট হিসাব করে দেখিয়েছে, দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করলে একজন পুরুষ গার্মেন্ট শ্রমিকের ৩৩৬৪ কিলোক্যালরি এবং নারী শ্রমিকের ২৪০৬ কিলোক্যালরি তাপ লাগে। এই হিসাবকে ভিত্তি ধরে কী পরিমাণ ও কী ধরনের খাদ্য প্রয়োজন ও তার বাজারমূল্য হিসাব করলেও ২৪৫৫০ টাকার কমে একটি পরিবার চলতে পারে না। সাধারণভাবে একজন মানুষের জন্য তাপশক্তি কত লাগে, এটা হিসাব করতে হলে বিভিন্ন কাজে কত কিলোক্যালরি তাপ লাগে তা জানা দরকার। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের একজন মানুষের তাপশক্তি প্রয়োজন হয় : মাঝারি গতিতে হাঁটলে (১২ মিনিটে ১ কি.মি.) ৪ কিলোক্যালরি, মাঝারি ধরনের কাজে ৩ কিলোক্যালরি, ঘরের কাজে ২ কিলোক্যালরি, বসে থাকতে (টিভি দেখা, গল্প করা) ১.৫ কিলোক্যালরি, ঘুমানোতে ১ কিলোক্যালরি প্রতি মিনিটে প্রয়োজন হয়।

এই হিসাবে একজন গার্মেন্ট শ্রমিকের প্রতিদিন কত কিলোক্যালরি তাপ প্রয়োজন :

৮ ঘণ্টা কাজ (৮×৬০×৩)=১৪৪০ কিলোক্যালরি
৮ ঘণ্টা ঘুম (৮×৬০×১)=৪৮০ কিলোক্যালরি
১ ঘণ্টা বিরতি (১×৬০×১.৫)=৯০ কিলোক্যালরি
২ ঘণ্টা ওভারটাইম (২×৬০×৩)=৩৬০ কিলোক্যালরি
২ ঘণ্টা ঘরের কাজ (২×৬০×২)=২৪০ কিলোক্যালরি
২ ঘণ্টা অবসর, আড্ডা, গল্প (২×৬০×১.৫)=১৮০ কিলোক্যালরি
১ ঘণ্টা হাঁটা : কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসা (১×৬০×৪)=২৪০ কিলোক্যালরি
সর্বমোট=৩০৩০ কিলোক্যালরি

নারী শ্রমিকদের ওজন ৫০ কেজি ধরলে এর কিছুটা কম কিলোক্যালরি তাপ লাগবে। আবার সন্তানসম্ভবা কিংবা প্রসব-পরবর্তী সময়ে খাবার ও পুষ্টি কিছু বেশি লাগবে। এখানে আরো একটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। গার্মেন্টসের একজন নারী শ্রমিক ঘুমায় কতক্ষণ? এক হিসাবে দেখা গেছে, মাত্র ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা। তাকে রান্নার জন্য লাইন দিতে হয়, বাথরুমে যাওয়ার জন্য লাইন দিতে হয়। এ কারণে ফ্যাক্টরিতে দেরিতে এলে মজুরি কেটে নেয়া বা অনুপস্থিত দেখানো হয়, ফলে ঘুম বা বিশ্রাম না হলেও তাকে ছুটতে হয়। সুষম খাদ্য দ্বারা এই ক্যালরির প্রয়োজন মেটালে শারীরিক সুস্থতা এবং কর্মশক্তি রক্ষা করা সম্ভব। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, মোট খাদ্যের ৫৭ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট, যেমন–চাল-আটা দ্বারা, ৩০ শতাংশ চর্বিজাতীয় খাবার, যেমন–তেল-ঘি-মাখন দ্বারা এবং ১৩ শতাংশ প্রোটিনজাতীয় খাদ্য, যেমন–মাছ-মাংস, ডিম-দুধ দ্বারা পূরণ করা দরকার। ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ খুবই প্রয়োজন, রোগ প্রতিরোধ এবং শক্তি ব্যবহার করার জন্য। আয়রন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম শক্তি উৎপাদন করে না, কিন্তু এগুলোর অভাব হলে শরীর কর্মক্ষম থাকতে পারে না। ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্যের জন্য শাক-সবজি ও ফলমূল খাওয়া প্রয়োজন।

বাজারে প্রাপ্ত সস্তা খাবার দ্বারা যদি একজন শ্রমিক তার শক্তি ও পুষ্টি রক্ষা করতে চায়, তাহলে প্রতিদিন নিম্নরূপ খরচ হবে :

খাবারের নাম	কিলো ক্যালরি	বাজারমূল্য (টাকা)
১. চাল ৫০০ গ্রাম	২০০০	১৮
২. ডাল ৬০ গ্রাম	২০০	৮.৫
৩. তেল (সয়াবিন) ৫০ মিলিলিটার	৪৫০	৫
৪. ডিম ১টি	৭০	৮
৫. মাছ ৬০ গ্রাম	৮০	১০
৬. আলু ১০০ গ্রাম	১০০	৩
৭. শাক-সবজি ১৫০ গ্রাম	৫০	৩.৫
৮. কাঁচা মরিচ, মসলা, হলুদ	-	৫
৯. ফল : ১টি কলা	৫০	৭
১০. রান্নার খরচ		০৫.০০ (লাকড়ি বা কেরোসিন খরচ)
১১. চা : দিনে ২ কাপ		১০
সর্বমোট	৩০০০	৮৩ টাকা

(আমরা জানি অসুস্থ হলে খরচ বাড়ে আবার শিশুদের ভাত কম লাগে, কিন্তু শিশুদের অন্যান্য খরচ বেশি। তাই সব মিলে গড়ে ৮৩ টাকা প্রতিদিন খরচ ধরলে)।

৫ জনের পরিবারের খরচ কত?

খাওয়া খরচ (৮৩×৫×৩০)=১২৪৫০
বাসাভাড়া {২ রুমের ভাড়া (৪০০০)+পানি+বিদ্যুৎ}=৫০০০
যাতায়াত–২ জন কর্মজীবী মানুষ (৫০০×২)=১০০০
চিকিৎসা (২০০×৫)=১০০০
শিক্ষা খরচ=২০০০
অতিথি আপ্যায়ন=১০০০
তেল, সাবান, টুথপেস্ট, শেভিং কিটস, ক্রিম, পাউডার=৫০০
জুতা, স্যান্ডেল=২০০
মোবাইল খরচ=৪০০
পোশাক (বছরে ৪ সেট কাপড়, বিছানার চাদর)=১০০০
সর্বমোট=২৪৫৫০

এখানে সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়, বিনোদন, অতিথি আপ্যায়ন হিসাবে ধরা হয়নি। এগুলো ছাড়া কি মানুষের জীবন চলে? না। কে না চায় তার সন্তান সুস্থ থাক, শিক্ষিত হোক। বৃদ্ধ বয়সে যখন কর্মক্ষমতা থাকে না তখন একজন মানুষ ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ে। এই অসহায় সময়ে জীবনধারণের জন্য সঞ্চয় করা বা সন্তানের ওপর নির্ভর করতে সবাই চায়। ভবিষ্যতের জন্য বা যে কোনো বিপদ-আপদের সময় কাজে লাগানোর জন্য কোনো সঞ্চয় কি শ্রমিক করবে না? শ্রমিক কি তার মা-বাবার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে না? যদি নিতে হয় তাহলে তার মজুরি কত হওয়া উচিত? একটা প্রশ্ন আসতে পারে–চাকরির শুরুতেই তো শ্রমিকের বিয়ে এবং সন্তান-সন্ততি হবে না। তাহলে শুরুতে বেতন কত হওয়া উচিত? আমরা মনে করি, শ্রমশক্তি দ্বারা যা উৎপাদন হয় এবং জীবনধারণ করতে যা যা প্রয়োজন হয় তার মূল্য বিবেচনা করে শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি ১৫০০০ টাকা হওয়া উচিত।

মন্ত্রী-এমপিদের বেতন বাড়ে, শ্রমিকের বাড়বে না কেন?

দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপিদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যে নতুন পে স্কেল বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এবার নতুন পে স্কেল অনুযায়ী সর্বনিম্ন বেতন দাঁড়াবে প্রায় ১৩৮০০ টাকা। সর্বোচ্চ বেতন দাঁড়াবে (৭৮ হাজার টাকা মূল বেতন ধরলে) দেড় লাখ টাকারও বেশি। তাহলে যারা উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত, তাদের বেতন কত হওয়া উচিত? পে স্কেল ঘোষণার পর থেকেই দ্রব্যমূল্য, বাড়িভাড়া, এখন গাড়িভাড়াও বেড়ে গেছে। ফলে গার্মেন্ট শ্রমিকরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশার মধ্যে পড়েছে।

কারণ শুধু জীবনধারণ করার জন্যই তো চাকরি নয়, নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করতে হবে। আজ থেকে ২৫ বছর পর দেশের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে শ্রমিকের সন্তানের কথা ভাবতে হবে। জীবনযাত্রার ব্যয় যখন সর্বত্র বাড়ছে, তখন ১৫০০০ টাকা মজুরি দাবি কি একেবারেই ন্যূনতম নয়? অতীতে সব সময় পে কমিশনের চেয়ে শ্রমিকের মজুরি বেশি নির্ধারণ করা হতো।

দেশের অর্থনীতির অবস্থা এবং মালিকদের সক্ষমতাসহ সামগ্রিক বিবেচনায় একজন গার্মেন্ট শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি তাই হওয়া উচিত কমপক্ষে ১৫০০০ টাকা।

দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতার স্বার্থেই শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন

শ্রমিক বেতন পেলে সে টাকা দেশেই খরচ করে। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেমন–কাপড়, সাবান, টুথপেস্ট, স্যান্ডেলসহ নানা দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রি বাড়ে। লুটপাটকারী ধনীরা বিদেশে বাজার করে, বিদেশে টাকা পাচার করে। শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি মানে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারিত হওয়া এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। তাই যে দেশের শ্রমিকদের মজুরি বেশি সে দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত উন্নত। পাঁচ-ছয় হাজার টাকা বেতনের একজন দরিদ্র শ্রমিক মানে কম খেতে পাওয়া, চিকিৎসাহীন দুর্বল শ্রমিক। তার কাছে বেশি উৎপাদন আশা করা বোকামি। দুর্বল শ্রমিকের সন্তান শারীরিকভাবে দুর্বল এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে ২৫ বছর পরে কী ধরনের শ্রমশক্তি পাব তা ভাবলে আতঙ্কিত হতে হয়। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনা করলে এবং দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেই সকল শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ১৫০০০ টাকা করা প্রয়োজন। একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, মজুরি কোনো দয়া নয়। উৎপাদনক্রিয়ার অংশীদার হিসেবে শ্রমিককে বিবেচনা করে বাজারদরের সাথে সংগতি রেখে জীবনধারণের মতো মজুরি তাকে দিতেই হবে।

মজুরি বাড়ালে গার্মেন্ট চলে যাবে অন্য দেশে–এ ধারণা অমূলক

মজুরি কত কম দিলে বিদেশের বাজার ধরে রাখা যাবে অথবা মজুরি বাড়লে তাতে পণ্যের দামের ওপর কত প্রভাব পড়বে সে সম্পর্কে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে গার্মেন্টশিল্প অন্য দেশে চলে যাবে কি না।

ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২০১৩ সালের ১০ মে এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানায়, বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি দ্বিগুণ করলে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে একটি টি-শার্টের দাম বাড়বে মাত্র তিন সেন্ট। আমেরিকায় একটি টি-শার্টের দাম ৩ থেকে ১৫ ডলারের মধ্যে। বিভিন্ন কারণে সেখানে টি-শার্টের দাম ১০ থেকে ৩০ সেন্ট বাড়ে-কমে। তাহলে ৩ সেন্ট দাম বাড়লে সেখানকার ক্রেতারা টি-শার্ট কিনবে না–এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসলে দেশি মালিক আর বিদেশি মালিক-বায়াররা মিলে শ্রমিককে কম মজুরি দেয়ার জন্য মিথ্যা ভূতের ভয় দেখায়। বাস্তবে গার্মেন্ট চলে যাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো চীনসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের দেশে কাজ আসছে, ইতিমধ্যে চীনের ব্যবসায়ীদের একটা বড় দল বাংলাদেশ ঘুরে গেছে। তারা সরকারের উচ্চপর্যায়ের সাথে বৈঠক করে গেছে।

বাংলানিউজ২৪.কম ১৪ মার্চ ২০১৩ তারিখের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, থাইল্যান্ড-মালয়েশিয়া ছেড়ে বাংলাদেশে আসছে ব্যবসায়ীরা। বেপজার চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল কে এম মমিনর রহমান বলেন, চীনে শ্রমিকের গড় মজুরি ৫০০ ডলার, ভিয়েতনামে ৩০০ ডলার। চীন থেকে ব্যবসায়ীরা থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়ায় যাওয়া শুরু করেছিল। এসব দেশে শ্রমিকের গড় মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে এখন ৩০০ ডলার। বাংলাদেশ এখন তাই তাদের পছন্দের শ্রম তালিকায়। এখানে গড় মজুরি ৭০ ডলারেরও কম।

পি এইচ গার্মেন্টস থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এসেছে। তাকে জায়গা দেয়া হয়েছে কর্ণফুলী এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে। মালয়েশিয়া থেকে সব কারখানা বন্ধ করে বাংলাদেশে এসেছে গ্লোবাল লেবেল। স্যামসাং বাংলাদেশে আসতে চায়। বেপজার কাছে ৫০০ প্লট চেয়েছে তারা। চট্টগ্রাম ইপিজেডের পাশে একটি জায়গার কথা ভাবছে বেপজা। চীনের পাঁচটি বড় কোম্পানি মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আসতে চায়। এ সবই কিন্তু সস্তা ও দক্ষ শ্রমশক্তির কারণে। পোপ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, বাংলাদেশে শ্রমদাস ব্যবস্থা চলছে। এই দাসরা যদি একটু পেট ভরে খাওয়ার মতো ব্যবস্থা, রাতে ঘুমানোর জন্য ভাড়া করে থাকার মতো ঘর এবং কোনো রকমে বাঁচার মতো মজুরি পেতে চায়, তাহলে রব ওঠে–গার্মেন্টস আর থাকবে না। এ ধরনের কথা বলার উদ্দেশ্য হলো–শ্রমিকদের গার্মেন্ট অন্য দেশে চলে যাওয়া ও চাকরি হারানোর ভয় দেখিয়ে কম মজুরির ফাঁদে আটকে রাখা। বাংলাদেশের প্রচুর শ্রমশক্তি এবং দক্ষ শ্রমিককে এরা সস্তা মজুরির ফাঁদে আটকে রাখতে চায়।

মালিকরা শুধু মুনাফাই করে না, সরকারের কাছ থেকে সব রকম সুবিধা নেয়–শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি বাস্তবায়িত হবে না কেন?

মালিকরা শিল্প-কারখানা নির্মাণ করে শ্রমিকদের কাজ দিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, শিল্প-কারখানা বন্ধ হলে লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে–এসব কথা বলে মালিকরা সরকারের কাছ থেকে সব সময় সুবিধা নিয়ে থাকে। সরকারও ঘোষণা করে, তারা ব্যবসাবান্ধব

সরকার, ফলে তারা পরস্পরের সহযোগী। এ কারণেই জাতীয় সংসদে মালিক ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য, এরা আইন প্রণয়ন করে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এদের কোনো দাবিই সরকারের কাছে অপূর্ণ থাকে না। এরা প্রণোদনার নামে টাকা নেয়, ১ শতাংশ সুদে সরকারের কাছে ঋণ চায়, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা চায়–এদের চাওয়ার কোনো শেষ নেই। কিন্তু শ্রমিক মজুরি দাবি করলে বলে, তাদের সব উৎপাদনের জিনিসের দাম বাড়ছে, ফলে মজুরি বাড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু তারা যদি বাজারদরের সাথে তাল মিলিয়ে সুতা, কাপড়, যন্ত্রপাতি, রং, বিদ্যুতের দাম দিতে পারে, পরিবহনের বাড়তি ভাড়া মেটাতে পারে, তাহলে শ্রমিকের মজুরির বেলায় তার ব্যতিক্রম কেন হবে? শ্রমিকদের খাবার, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা খরচ, সন্তানের শিক্ষা খরচ কি বাড়ছে না?

দেশ উন্নত হচ্ছে, নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে; তার সাথে সাথে শ্রমিকের জীবন কি উন্নত হবে না? প্রতিনিয়ত হিসাব দেয়া হচ্ছে, স্বাধীনতার পর দেশের অনেক উন্নতি হয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে। খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি আয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ–সবই বাড়ছে। কিন্তু তার সাথে সংগতি রেখে শ্রমিকের জীবনযাপনের উপযোগী মজুরি যদি না বাড়ে তাহলে বৈষম্য ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৩১৪ ডলার। সেই হিসাবে ৫ সদস্যের একটি পরিবারে মাসিক আয় হওয়ার কথা গড়ে ৪৩৮০০ টাকা। একটি শ্রমিক পরিবারের মাসিক আয় কত? এই হিসাব থেকে বোঝা যায়, শ্রমিক যারা উৎপাদনের নিয়ামক শক্তি তারা গড় আয়ের কত নিচে পড়ে আছে। পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত শ্রমিক যেমন উৎপাদিকাশক্তি বাড়াতে পারে না, তেমনি মানবিক অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে না। স্বাধীনতার প্রধান লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশের বয়স যত বাড়ছে, সমাজে বৈষম্যও তত বাড়ছে।

সমাজে আয় বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত করে না, গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। যে শ্রমিকের শ্রমে-ঘামে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে সে কি গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে? ন্যায্য মজুরি ছাড়া শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা অর্থহীন। ন্যায্য মজুরির আন্দোলন তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ। আন্দোলন করলে শিল্প ধ্বংস ও দেশের ভাবমূর্তি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। পুলিশি নির্যাতন করে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ন্যায্য মজুরি না দিয়ে দমনমূলক ব্যবস্থা নিলে শিল্পে শান্তি বিরাজ করবে না। গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থেই ন্যায্য মজুরি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের বক্তব্য

গত চার দশকে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের পোশাকশিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অর্জনকারী গার্মেন্ট-শিল্পের রপ্তানি আয় গত অর্থবছরে ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০২০ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শ্রমিকদের ওপর জুলুম-নির্যাতন-দমননীতি চালিয়ে সস্তা শ্রমের ওপর বিকশিত গার্মেন্টশিল্পে আমরা দুটি চিত্র দেখতে পাই। একটি হলো সামান্য পুঁজি বিনিয়োগকারী মালিকরা নব্য ধনিকে পরিণত হয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। দেশ-বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। অপরটি হলো শ্রমিকদের জীবনে চলছে চরম অভাব-অনটন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য। আজও অনাহার-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করে রোগাক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয় অসংখ্য শ্রমিককে। বেঁচে থাকলে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করার কথা, কিন্তু ৪০-৪৫ বছর বয়সেই কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে হয়। বাকি ১৫-২০ বছরের কর্মক্ষমতাকে শোষণ-নির্যাতনের মাধ্যমে নীরবে হত্যা করা হয়। মালিকরা শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্টকে কোনো রকম বিবেচনায় নেয় না। সে কারণে শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযোগী ন্যায্য মজুরি নেই। অতীতের প্রাপ্ত রেশনিং, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। মালিকরা অর্থ-সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রভাবে রাষ্ট্র ও সমাজে ব্যাপক ক্ষমতা অর্জন করার ফলে আইন-কানুনের তোয়াক্কা করে না বিধায় অধিকাংশ কারখানায় আইনানুসারে শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ও অন্যান্য ছুটি প্রদান করা হয় না। উৎসব ভাতা, গ্র্যাচুইটি নেই। চাকরি শেষে সার্ভিস বেনিফিট প্রদান করা হয় না। এমনকি আজও আইডি কার্ড বা নিয়োগপত্র দেয়া হয়নি। শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে নিরাপত্তা আজও পুরোপুরি নিশ্চিত করা হয়নি। যার ফলে এ পর্যন্ত রানা প্লাজা, তাজরীনের পরেও অব্যাহতভাবে দুর্ঘটনাজনিত হত্যাকাণ্ড চলছে। এ পর্যন্ত অর্ধশতাধিক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও ভবনধসে প্রায় চার হাজার শ্রমিককে জীবন দিতে হয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিককে পঙ্গুত্বের জীবন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এসব জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে কখনও কখনও গার্মেন্ট শ্রমিকরা জীবন বাঁচাতে আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। মালিকরা তখন দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের আওয়াজ তোলে, উস্কানির আওয়াজ তোলে। সরকারও মালিকদের সুরে সুর মেলায়। শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্টকে বিবেচনায় না নিয়ে দমননীতি চালানো হয়।

সাম্প্রতিক আশুলিয়ায় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন দমন করার জন্য নানা রকম বিভ্রান্তমূলক অসত্য বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। সে বিষয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। সরকার ও বিজিএমইএ বলল যে, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কোনো দাবিনামা পেশ করা হয়নি। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ৫ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রীর নিকট এবং ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর নিকট নিম্নতম মূল মজুরি ১০০০০ টাকা এবং মোট মজুরি ১৬০০০ টাকা নির্ধারণের দাবিতে দাবিনামা পেশ করেছি। অপরাপর শ্রমিক সংগঠন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে দাবিনামা পেশ করেছে। দাবির বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এবং ফৌজদারি কার্যকলাপ ছাড়াই শ্রমিকদের নামে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দিয়ে শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে কারগারে আটক বলা হয়েছে। হাজার হাজার শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। বিজিএমইএ ঘোষণা দিয়ে ১৩(১) ধারায় ৫৯টি কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের বন্ধকালীন সময়ের বেতন না দেয়ার ঘোষণা দিল, যা আইনসংগত নয়। কেননা শ্রম আইনের ১৩(১) ধারা অনুসারে কোনো কারখানার কোনো সেকশন বা বিভাগের শ্রমিকরা বেআইনি ধর্মঘট করলে অন্য সেকশন বা বিভাগ চালাতে অক্ষম হলে সেক্ষেত্রে কারখানার মালিক শ্রম পরিদর্শকের অনুমতি সাপেক্ষে ১৩(১) ধারায় কারখানা বন্ধ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের বন্ধকালীন প্রথম তিন দিন মজুরি প্রদান করতে হবে। প্রথমত, নির্দিষ্ট কোনো কারখানার কোনো সেকশন বা বিভাগে

বেআইনি ধর্মঘট হয়নি। ফলে ১৩(১) ধারা প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়ত, শ্রম আইন বিজিএমইএকে কারখানা বন্ধ বা খোলার অধিকার দেয়নি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে, বাংলাদেশে গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নেই। ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলেই চাকরিচ্যুতি, হামলা-মামলার শিকার হতে হয়। নানা চাপে সাম্প্রতিক চার শতাধিক গার্মেন্ট কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হলেও মালিকরা তার স্বীকৃতি দেয় না এবং ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ করা সম্ভব হচ্ছে না। যেই মর্মে ইতিমধ্যেই আইএলও সরকার ও মালিকদের বলেছে। এদিকে আইএলও কনভেনশনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বারবার শ্রম আইনকে শ্রমিকদের বিপক্ষে মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রণয়ন করা হচ্ছে। শ্রম বিধিমালা-২০১৫ নামে একটি বিধিমালা করে শ্রমিকদের নির্যাতনের জন্য মালিকদের হাতে এটিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে তুলে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমিকদের অতীতের প্রাপ্ত রেশনিং, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা খর্ব করা হয়েছে। অনেক মালিক একটি-দুটি থেকে ২০-৩০টি, এমনকি ৪০-৫০টি কারখানার মালিক হলেও শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেনি। সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, আমরা এসব অধিকারের কথা বললেই মালিকরা সক্ষমতার কথা বলে, মজুরি বৃদ্ধি ও প্রদানের ক্ষেত্রে শিল্পের সক্ষমতা এবং শ্রমিকের চাহিদা–দুটি বিষয়ই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আমরা এক্ষেত্রে তিন স্তরের কারখানার কথা জানি। কিছু কারখানা বড় হয়েছে। কিছু মাঝারি, কিছু ছোট কারখানা আছে, যেখানে সময়মতো মজুরি দেয়া হয় না এবং সারা বছর কাজ না থাকায় সেখানকার শ্রমিকদের সম্পূর্ণরূপে অমানবিক জীবনযাপন করতে হয়। এ বিষয়ে কারখানার সক্ষমতা অর্জন না করায় শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আমরা এতক্ষণ মালিকদের উন্নতি ও শ্রমিকদের ওপর অন্যায়ভাবে নির্যাতনের কিছু বিষয় বুঝেছি। একই সাথে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে যে, বাংলাদেশের গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি পৃথিবীর যে কোনো দেশের শ্রমিকদের মজুরির তুলনায় কম। বর্তমান প্রাপ্ত মজুরিতে খেয়ে-পরে বেঁচে থেকে শ্রমিকদের পক্ষে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা রক্ষা করা কোনোক্রমেই সম্ভব হচ্ছে না। শ্রমিকদের জীবনের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে। মন্ত্রী, এমপি, আমলা, সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করা হয়েছে, কিন্তু গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি তোলায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলছেন, শ্রম আইন অনুসারে ৫ বছরের পূর্বে মজুরি বৃদ্ধির বিধান নেই। বাস্তবে প্রচলিত শ্রম আইন অনুসারে ৩ বছর পর মজুরি বৃদ্ধির আইনি বিধান রয়েছে, যা অতীতে ২ বছর পর পর বৃদ্ধি করার আইনি বিধান ছিল। তাছাড়া বর্তমান আইন অনুসারেও শ্রমিকরা ২ বছর পর পর দাবিনামা পেশ করতে পারে। এমনকি শ্রমিকের জীবনের ব্যয়ভার বৃদ্ধি হলে ১ বছর পরেও শ্রমিকপক্ষ দাবি জানালে মজুরি বৃদ্ধির বিধান রয়েছে। ২০১৩ সালে মজুরি বৃদ্ধির সময় সর্বনিম্ন মূল মজুরি ৩০০০ টাকা এবং মোট মজুরি ৫৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। কেননা ৩০০০-৪০০০ টাকা বাড়িভাড়া বাবদ প্রদান করার পরে মাত্র ১৩০০ থেকে ২৩০০ টাকায় কিভাবে একটি পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদনের খরচ মেটায়? ২০১৩ সালের মজুরি বৃদ্ধির সময়ই ৩ বছর পর পুনরায় মজুরি বৃদ্ধি করা হবে মর্মে মালিকরা আশ্বাস দিয়েছিল, যা ইতিমধ্যেই শ্রমসচিব জানিয়েছেন। এমতাবস্থায় সারা দেশের সকল গার্মেন্ট শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা অতীব জরুরি।

আজকের এই আলোচনায় 'শ্রমিক বাঁচাও-শিল্প বাঁচাও-দেশ বাঁচাও' নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রেখে শিল্পকে বিকশিত ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে মজুরি বৃদ্ধির দাবিসহ নিম্নলিখিত সুপারিশ আপনাদের সুচিন্তিত গুরুত্বপূর্ণ মতামতের জন্য পেশ করছি :

১। নিম্নতম মূল মজুরি ১০০০০ টাকা, বাড়িভাড়া ৪০০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১০০০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ১০০০ টাকা–সর্বমোট ১৬০০০ টাকা এবং সোয়েটারের পিসরেটসহ সকল শ্রমিকের একই হারে মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে।

২। অতি সত্বর মজুরি বোর্ডের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

৩। গ্রেপ্তারকৃত শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি দিতে হবে। রাষ্ট্রদ্রোহসহ সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৪। চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে।

৫। বেআইনিভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ১৩(১) ধারায় বন্ধকালীন সময়ের মজুরি দিতে হবে।

৬। গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য কারখানাভিত্তিক রেশনিং প্রথা চালু করে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রদান করতে হবে।

৭। গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক কলোনি গড়ে তুলে বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা ও বিনোদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮। শ্রম আইন ও বিধিমালার শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারা পরিবর্তন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং আইএলও কনভেনশন অনুসারে শ্রম আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

৯। আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুসারে শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করে সংঘবদ্ধ হওয়া, পছন্দমতো সংগঠন করা, দাবিনামা উত্থাপন, দর-কষাকষি এবং ধর্মঘট করার অবাধ অধিকার দিতে হবে।

১০। অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধি এবং সার্বিক পরিস্থিতির সমাধান করতে হবে।

[৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এই সংগঠন কতৃক আয়োজিত *'পোশাকশিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি : সমাধান কোন পথে?'* শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থাপিত মূল বক্তব্য]